স্মৃতির ভবিষ্যৎ ও রবের আঁতোয়ান

রাজা ভট্টাচার্য

এস, হে আমার লিঙ্গ-নির্বিশেষে জিন্স-টিশার্ট পরিহিত পাঠক! ক্ষণকালের জন্য আমাদের হুড়োহুড়ি-অগ্রগতি থামিয়ে আমরা স্থির হই। অগ্রগতি, উন্নয়ন, আধুনিক হয়ে ওঠার তীব্র চেষ্টা স্তব্ধ হোক দু-মিনিটের জন্য। এস, আমরা ফিরে তাকাই আমাদের পার হয়ে আসা পথটির দিকে। ধুসর পথরেখাটির দিকে— ইতিমধ্যেই যার দখল নিতে এগিয়ে আসছে বিস্মৃতির ঘাস। তাকাই, আর নিজেকে জিজ্ঞাসা করি— 'আচ্ছা, আমার প্রপিতামহের নাম কী ছিল? কী করতেন তিনি? কেমন দেখতে ছিলেন? কোথায় বাস করতেন তিনি?' প্রশ্ন করি।

তার পর নিরুত্তর হয়ে যাই।

নিরুত্তর, কেননা আমরা বড়ো জোর মনে করতে পারি পিতামহের নাম। দীর্ঘ আয়ুর এই যুগে আমরা অনেকে দেখেছি তাঁকে, কেউ কেউ না দেখলেও শুনেছি তাঁর কথা। তার আগের কথা আমাদের মনে নেই। ভুলে গেছি। আমরা জানি আমরা 'এখন কোথায় আছি', কী আমাদের 'বর্তমান অবস্থান'। আমরা ভুলে গেছি আমরা 'কোথা থেকে এসেছি'। কোথায় ছিলাম। মনে করতে ভুলে গেছি আমরা। ভুলে গেছি, এই বিস্মরণ আমাদের আপন ভূমি থেকে উচ্ছিন্ন করে, মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আর আরও বিপজ্জনক দিক হল— আমরা ভুলে রয়েছি যে, আমরা ভুলে গেছি।

আর তাই, এস, হে আমার ফেসবুকে নিরন্তন সমকাল খুঁজে-ফেরা পাঠক— আমরা ফিরে তাকাই অতীতের দিকে। মাত্র দুই বা তিন প্রজন্ম পিছনের কথাও যখন আমাদের কাছে ধূসর, তখনই আমি তোমাদের ফিরে তাকাতে বলছি আরো অনেক পিছনে। অনেক ... অনেক। মনসামঙ্গলের আগে, চর্যাপদের আগে, কাদম্বরীর আগে, এমনকী সেই সময়েরও আগে, যখন বাল্মীকি লিখবেন তাঁর আদিকাব্য। শোক থেকে যখন জন্ম নিয়েছিল শ্লোক— তারও আগে। তখনও নিজের প্রথমতম বিখ্যাততম শ্লোক— 'মা নিষাদ' লেখেন নি বাল্মীকি। তখনও বলেন নি— 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'...!!— এ আমি কী বললাম। সেই অতিদূর ধূসর অতীতে এবার আমরা ফিরে তাকাব। আমরা জানি, ইতিহাসের দৌড় খুব বেশি পিছন পর্যন্ত নয়। আজ আমরা জানি, ইতিহাসের বেড়া দেয়া জমিরও ওপাশে, 'বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগতেরও' ওপারে আরও এক জগত ছিল একদিন। স্মৃতির জগত। গ্রিক দেবী ক্যালিওপের জগত—

যিনি আমাদের মত সসীম আয়ুসম্পন্ন মানুষের সামনে খুলে দেন স্মৃতির দরজা। এস, প্রার্থনা করি তাঁর কাছে— ক্যালিওপের কাছে, তিনি যেন অনুমতি দান করেন সেই অতিদূর অতীতের গর্ভে প্রবেশ করার। ইতিহাসের দেবী 'ক্লিও'-র অধিকারও তো অতদূর বিস্তৃত নয়, যতটা তাঁর! কেননা, আমরা এই নিবন্ধে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবো সেই দূরতম অতীত পৃথিবীতে, যখন মহাকাব্য— এমনকী আদি মহাকাব্যটিও 'লেখা' হয়নি। তখনও তা মুখে মুখে ফেরা মানুষের গান। দেবতার গাথা। এস।

প্রাচীনত্বের মোহের মতই, আধুনিকতারও মোহ আছে। আমাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রায় সর্বদা বলবৎ— সমকালের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকার ইচ্ছা। 'সময়-কে সাথ' চলতে আমরা বাধ্য, তা নইলে 'পিছিয়ে পড়তে হয়।' এই জন্যই যুগে যুগে প্রাচীন গ্রন্থগুলি শুধু 'পড়ে' তৃপ্তি হয় না আমাদের। আমরা চেষ্টা করি তার নতুন নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে বার করার। আর সে গ্রন্থের নাম যদি হয় 'রামায়ণ'— তা হলে সেই নূতনতর পাঠের আর অন্ত থাকে না। কখনো কালিদাসের 'রঘুবংশমে', কখনো ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে', কখনো মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'— তা যুগে যুগে, ফিরে ফিরে দেখা হয়, লেখা হয়। এমনকী রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'-র ব্যাখ্যা করতেও ফিরে আসেন রামায়ণের দ্বারপ্রান্তে। কর্ষণজীবী আর আকর্ষণজীবীর দ্বন্দ্বের আলোয় নতুন ব্যাখ্যা পায় 'রামায়ণ'। কিন্তু তাহা হইলে পুরাতনের কী হইবে? আমাদের সেই চিরন্তন পুরাতন রামায়ণ— যে পণ্ডিতের পুথি থেকে নিমতলার ঘাটের মধ্যরাত্রের রামযাত্রা পর্যন্ত তার আসন ছড়িয়ে রেখেছে? সেই ভাগ্যহত যুবরাজের গল্পের কী গতি হবে, যাকে প্রথম যৌবনেই বনে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কামাসক্ত পিতা! আর তাঁর স্ত্রীকে হরণ করেছিল এক মহাবলী লম্পট রাক্ষসরাজ! সেই রামচন্দ্রের কী হবে, যাঁর বীরত্ব অসীম, মাহাত্ম্য অতুলনীয়, ভুল গগনচুম্বী, প্রেম সমুদ্রব্যকুল! তিনি 'কোথায় ছিলেন'? 'কোথা থেকে' এলেন তিনি আসলে?

ঠিক এই প্রশ্নগুলোই তোলেন রবের আঁতোয়ান— তার বইয়ে— যার নাম 'রাম এবং চারণেরা, রামায়নে এপিক স্মৃতি'। আমাদের তিনি হাত ধরে পার করে দেন লেখ্য যুগের চৌকাঠ। নিয়ে যান সেই দূরতম অতীতে— যখন রামায়ণ লেখা হয়নি। কিন্তু চারণেরা ঘুরে ঘুরে গেয়ে বেড়ান অলৌকিক এক জীবনের জয়গাথা। শ্রীরাম ফিরিয়ে নিয়ে যান সেই 'কৃত্যযুগে'— যখন রামেরও জন্ম হয়নি। সেই বহু প্রাচীন কৃত্যযুগে, যখন রাবণের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত দেবতারা গিয়েছিলেন বিষ্ণুর কাছে, তখনই আসলে এই গল্পের আরম্ভ। কেননা রাবণ তখন ছিলেন ব্রহ্মার বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। বিষ্ণুর পক্ষে দেবতা অবস্থায় সেই বরকে ভেদ করা সম্ভব নয়। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও বলছেন— 'পদ্মযোনি ব্রহ্ম যে বর দিয়েছেন, তাকে সত্য প্রমাণ করা আমাদের কর্তব্য'— তত্তু সত্যং বচঃ কার্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা। স্বভাবতই, বিষ্ণুও এই সামূহিক কর্তব্যের বাইরে নন। কিন্তু সেই বরে যে রন্ধ্রটুকু ছিল— তাই দিয়েই বিষ্ণু প্রবেশ করবেন বলে স্থির করলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন— সময় এলে তিনিই অগ্রগামী সৈন্যসহ রাবণকে বধ করবেন— অহমেব নিহন্তাস্মি রাবণঃ সপুরঃসরম। কিন্তু তার জন্য তাঁকে নিতে হবে মনুষ্যজন্ম।

সেই মনুষ্যজন্ম ধারণ করার জন্য অবশ্য বিষ্ণুকেও হতে হচ্ছে অভিশপ্ত। সেই সত্যযুগেই তাই শুরু হয় সেই প্রস্তুতি— যাকে উত্তরামচরিতেরই প্রতিসাম্যে আমরা নাম দিতেই পারি— 'পূর্বরামচরিত'। তখন দেবতাদের দ্বারা পরাজিত হয়ে অসুরেরা আশ্রয় নিয়েছিল ভৃগুপত্নীর কাছে। ভৃগুপত্নী অসুরদের অনুগ্রহ করেছেন বলে ক্রুদ্ধ বিষ্ণু ভৃগুপত্নীর মাথা কেটে ফেলেন ভয়ংকর চক্রের দ্বারা— তয়া পরিগৃহীতাংস্তান্ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধ সুরেশ্বরঃ। চক্রেণ শিতধারেণ ভৃগুপত্ন্যাঃ শিরে'হরত।। স্ত্রীর এইরকম করুণ মৃত্যুতে, এবং দেবতার এমন পাশব আচরণে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হলেন মহামুনি ভৃগু। তিনিও দিলেন ভয়ংকর অভিশাপ— 'হে বিষ্ণু! আমার স্ত্রী তোমার বধ্য নয়, তবু তুমি তাকে হত্যা করলে! তাই তুমি মনুষ্যলোকে জন্মাবে'— যস্মাদবধ্যাং মে পত্নীমব ধীঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। তস্মাত্ত্বং মানুষে থেকে জনিষ্যসি জনার্দন।। অভিশাপ অবশ্য এখানেই শেষ হচ্ছে না। এর আরও একটু অংশ আছে— তা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দরকার হবে। কিন্তু আপাতত দেখছি, ভৃগুও বিষ্ণুকে এইরকম সাংঘাতিক অভিশাপ দিয়ে নিজে চিন্তায় পড়লেন— কাজটা ঠিক হলো কিনা। কিন্তু উদ্ধার করলেন বিষ্ণু নিজেই। তিনি এই অভিশাপ 'স্বীকার' করলেন— কেন? না— 'লোকসমূহের প্রিয়কার্য সম্পাদনের জন্য'— লোকানাং সম্প্রিয়ার্থস্তু তং শাপং গৃহ্যমুক্তবান্। আমরা জানি, এই প্রিয়কার্য কী। রাবণবধ— যে কাজ বিষ্ণু দেবতা-অবস্থায় করতে পারেন না। কেননা তা হলে যে আবার মিথ্যা হয়ে যায় ব্রহ্মার বর। সফল তপস্যার শেষে রাবণ যখন ব্রহ্মার দেখা পেলেন, তখন গর্বিত রাবণ দেব-দৈত্য-দানব-যক্ষ এবং অন্যান্য অলৌকিক প্রাণীদের হাতে যেন মৃত্যু না হয়— এই বর চেয়েছিলেন। নিতান্ত তুচ্ছ প্রাণিকূলকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। বলেছিলেন— 'হে অমর পূজিত! অন্য প্রাণীদের নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই, কারণ মানুষ আর অন্যদের আমি তৃণতুল্য বলে মনে করি।' তৃণভূতা হি তে মন্যে প্রাণিনো মনুষাদয়।' এই হলো ব্রহ্মার বরের সেই 'রন্ধ্রপথ'— যা এইবার বিষ্ণু ব্যবহার করবেন লোকসমূহের প্রিয়কার্য— রাবণবধের জন্য। এই অভিশাপ তাঁকে বরং একটি সুযোগ দিচ্ছে— মানুষ হয়ে জন্মানোর সুযোগ। রামচন্দ্র-রূপে মনুষ্যলোকে জন্ম নিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

রামের অলৌকিক জন্ম এবং কর্ম তাহলে কোনো মহাকাব্যের একমাত্র বিষয় নয়— আধুনিক 'প্রকৃত' রামায়ণের স্রষ্টারা যেমন বলছেন! আসলে তা কৃত্যযুগের বহু ঘটনা পরম্পরার শেষ ধাপ। যেমন আরও এক শেষ ধাপ সীতার জন্ম, কিংবা রাবণের পরনারী-ধর্ষণের ব্যাপারে বিরত থাকা। আধুনিক মন বলতেই পারে, এইভাবে সবকিছুই যদি হয়ে ওঠে পূর্বনির্ধারিত, তাহলে তো রামের প্রচণ্ড বীর্যবত্তাও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। রামের হাতে রাবণের মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী, তাহলে রামের বীরত্বপ্রকাশের অর্থ কী? ঠিক কথা। এবং ভুল ধারণা। এখানেই ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন স্মৃতির দেবী ক্যালিওপে। কেননা তাঁর স্মৃতিই যায় সেই দূর অতীত পর্যন্ত, যখন 'কথা'— কথাই ছিল চরম সত্য। ব্রহ্মা বা বিষ্ণু যখন কথা দেন, সত্যবদ্ধ হন, তখন তা সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মত অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে পরিণত হয়। রামায়ণের গ্রন্থবদ্ধ হওয়ারও আগে, সেই সুদূর অতীতে-রামকথা যখন ধ্বনিত হতো চারণদের কণ্ঠে— এই ঘটনা

পরম্পরার অমোঘত্ব আসলে সেই যুগের স্মৃতি বহন করছে। রামের জন্ম হয়— কেননা সত্যযুগে বিষ্ণু 'কথা' দেন— তিনি রাম হয়ে জন্মাবেন। সীতার জন্ম হয়, কেননা ধর্ষিতা বেদবতী ধর্ষক রাবণকে 'কথা' দেন— তিনি রাবণের মৃত্যুর কারণ হবেন। সম্পূর্ণ উত্তরাকাণ্ডকে 'প্রক্ষিপ্ত' বলে বাতিল না করে, এস পাঠক— আমরা 'অমোঘ কথা'-র যুগে প্রবেশ করি। অথবা, স্বয়ং আঁতোয়ানের ভাষায়— 'এপিক-স্মৃতির যুগে।' এ হল সেই সব স্মৃতি, যার ওপর নির্ভর করে বাল্মীকি পরবর্তীকালে 'রচনা করবেন' পুরনো রামকথাকেই। রামায়ণ রচয়িতা যে নিজেই রামায়ণের একটি চরিত্র, তা আমরা খেয়াল করি না। খেয়াল করি না, রামায়ণের আখ্যান বাল্মীকির স্বকপোলকল্পিত নয়। তাকে তা বলে দিচ্ছেন দেবর্ষি নারদ, বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরেই— 'মহর্ষি! আমার অত্যান্ত কৌতূহল হচ্ছে। আপনিই ওই পুরুষকে জানতে সমর্থ। সুতরাং আমার কৌতূহল আপনি মিটিয়ে দিন।'— এতদিচ্ছম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে। মহর্ষে ত্বং সমর্থোऽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্। প্রায় তৎক্ষণাৎ, এই প্রার্থনার প্রতিতুলনায় আমাদের মনে পড়ে যায় অ্যাগামেম্নন্-এর মিত্রপক্ষের বর্ণনা করার আগে হোমারের প্রার্থনা— 'অলিম্পাস-অধিষ্ঠাত্রী হে কলাদেবীরা! এবার আমাকে বলো— যেহেতু তোমরা দেবী এবং সকল ঘটনার সাক্ষী; অন্যদিকে আমরা— যা আমাদের বলা হয় না, সে বিষয়ে কিছুই জানি না!' ভার্জিলও কী বলেন না— 'হে কলাদেবীরা!... তোমাদের স্মৃতি বিশ্বস্ত, তোমরাই পারো আমাদের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে। আমাদের, অর্থাৎ মানুষের কাছে অতীতের শুধু ক্ষীণ রেশ এসে পৌঁছয়।' আমরা খেয়াল করি না, স্বয়ং রামচন্দ্রও রামায়ণের একজন শ্রোতা। মহামুনি বাল্মীকি তাঁর আশ্রমে প্রতিপালিত দুই বালককে পাঠিয়ে দেন রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে। তারাই সপারিষদ রামকে 'গেয়ে শোনায়' রামকথা— তার তারই ফলে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র জানতে পারেন— এই দুই সুকণ্ঠ বালক তপস্বীর মায়ের নাম সীতা! এরা তাঁরই দুই ছেলে— কুশ আর লব!

এই সমস্ত রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাই একই দিকে ইঙ্গিত করে। 'প্রকৃত' রামায়ণ বাল্মীকির কোনো নিজস্ব রচনা নয়— তার বহু আগে থেকেই রামের পুণ্যজীবনকথা চারণেরা গেয়ে বেড়াতেন সেই আদিম ভারতবর্ষের সর্বত্র— ব্রাহ্মণের কুটির থেকে রাজার প্রাসাদে, পথে পথে, যজ্ঞে ও উৎসবে। এখান থেকেই রবের আঁতোয়ান শুরু করেন তার হাইপোথিসিস— অবশ্যই তাঁকে পথ দেখান মিলম্যান পেরি, অ্যালবার্ট লর্ড; বা আরো আগে যিনি হেঁটে গিয়েছেন এই স্মৃতির সরণীতে— মাতিজা মুর্কো। আঁতোয়ান আমাদের দেখান, শুধু প্রাচীন মহাকাব্যকে নতুন যুগের আলোয় বিচার করাই তার প্রতি একমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ নয়। তার মূলে পৌঁছনোও ততটাই প্রয়োজনে। প্রয়োজন সেই চারণদের আদি গাথাগুলির প্রকীর্ণ চিহ্ন 'লিখিত' রামায়ণের শরীর থেকে খুঁজে বার করা। আমরা জানি, রামায়ণের ষষ্ঠ— অর্থাৎ যুদ্ধকাণ্ডম্-এর শেষেই একবার বর্ণনা করা হয়েছে গ্রন্থপাঠের ফল। এটি এক অভ্রান্ত প্রমাণ— এককালে রামায়ণ ছয় কাণ্ডেই শেষ হত। কিন্তু তা মেনে নিলে আমরা ভ্রষ্ট হয়ে পড়ি সেই এপিক স্মৃতির উত্তরাধিকার থেকে। সেই 'কথা'র পারম্যের যুগ থেকে। ভুললে চলবে না,

রামের জীবন অনায়াসেই কেটে যেতে পারত অযোধ্যার রাজদণ্ড ধারণ করে, সীতার সঙ্গে অনন্ত সুখী দাম্পত্যে, দুই সন্তানকে রাজ্য ভাগ করে নিশ্চিন্তে বৃদ্ধ রাম তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গে হেঁটে যেতেন সরযু নদীর দিকে— দেবলোকে ফিরে যাওয়ার জন্য— ইচ্ছামৃত্যুর মহান সমাপ্তির দিকে। তাঁর জীবনে আসতোই না এই দুর্ভাগ্যের ঝঞ্ঝা— যদি না তাঁরও প্রশ্নহীন আনুগত্য থাকতো 'কথা'র প্রতি। সেই 'কথা', যা তাঁর কামাসক্ত পিতা দিয়েছিলেন তাঁর কুহকিনী ক্রুর বিমাতাকে! দশরথের সেই দুর্বল মুহূর্তের কথাটুকুই হয়ে ওঠে রামের পিতৃসত্য। আর সেই সত্য পালনের জন্যই তাঁকে রাজৈশ্বর্য ছেড়ে যেতে হয় বনে। আর এই বনগমনই তাঁর জীবনকে বইয়ে দেয় এক অভূতপূর্ব খাতে— যা তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল। এক কথায়, সমগ্র রামায়ণ, রামের সমস্ত প্রেম-অপ্রেম-ভুল-ঠিক-বীরত্ব-ন্যায়-অন্যায়... সব কিছুই নির্ভর করে আছে সেই কথার পারম্যের উপরেই। এপিক স্মৃতির না-উপড়ানো শিকড়!

সেই শিকড়েই আমাদের পৌঁছে দেন আঁত্রোয়ান। কেননা তিনি জানেন, ইতিহাস যেখানে পৌঁছতে পারে না, সেই কুয়াশায় আমাদের পথ দেখায় স্মৃতি— ক্যালিওপে জানেন সেই রহস্য। একটি জাতি তার সমস্ত শুভবোধ, আস্তিক্য, মঙ্গলচিন্তা সঞ্চয় করে রাখে সেই এপিক স্মৃতির ভাণ্ডারে। সেই স্মৃতিই তার ভবিষ্যতের পথরেখা নির্মাণ করে।

এসো, ভবিষ্যতের স্বার্থে আমরা অতীতের পথে হাঁটি। পিতাকে প্রশ্ন করি— তাঁর পিতামহের নাম কী ছিল।